ভারতীয় সুন্দরবনের জঙ্গলজীবী মহিলারা

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

(অধ্যাপক সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ)

এ এমন এক জঙ্গল যার তুলনা করা যায় না পৃথিবীর অন্য কোনও জঙ্গলের সাথে। একটানা এত বিশাল অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ যেমন পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই, তেমনি এই জোয়ার-ভাঁটার নিত্য আসা যাওয়ার জঙ্গলে বাঘ-এর দেখাও অন্য কোথাও মেলে না। শুধু এই 'বাঘ' সম্পর্কিত খ্যাতি বা অখ্যাতিই সুন্দরবনকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তা নয়। পৃথিবীর আর কোনও এমন ভয়ঙ্কর বনের এত কাছে এত ঘন স্থায়ী মানুষের বসতির দেখা পাওয়া সহজ নয়। শুধু বসতি নয়, এই বসতির জঙ্গল নির্ভরতাও অবাক করার মত, আজও।

সুন্দরবন বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক হিসাবে গত কয়েকবছর ধরে ভারতীয় সুন্দরবনের কিছু জঙ্গলঘেঁষা প্রান্তিক গ্রামে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। 'সুখী' ক্ষেত্রসমীক্ষকের মত রেকর্ডারে ধরে রাখা সেইসব তথ্য বা অভিজ্ঞতা সুন্দরবনের 'নতুন' পরিচয় পাঠকের কাছে তুলে ধরবে এমনটা প্রত্যাশা করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটি সুবিধার দিক হল এই সময়কালে সুন্দরবন নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে কাজ করছেন তাঁদের নিরন্তর সাহচর্য লাভ। নিজেদের দেখা (সে দেখা অবশ্য নেহাতই অন্ধের হস্তী দর্শন) আর এইসব সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ এবং সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার নিরিখে এই লেখা।

আজ এই দুহাজার পনের-ষোল সালেও ভারতীয় সুন্দরবনের জঙ্গলঘেঁষা গ্রামগুলোতে মানুষের জঙ্গল নির্ভরতা অবাক করার মত। এই আলোচনায় ভারতীয় সুন্দরবনের জঙ্গল প্রান্তবর্তী গ্রামের মহিলাদের জঙ্গলনির্ভরতা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব।

ভারতীয় সুন্দরবনের জঙ্গলঘেঁষা গ্রামগুলির মহিলাদের জনগণনার পরিসংখ্যানে চোখ বোলালে দেখা যাবে এখানে গড়ে ৮০ শতাংশ মহিলা 'কর্মহীন' হিসাবে চিহ্নিত!

গোসাবা, ক্যানিং বা হিঙ্গলগঞ্জের কোনও জঙ্গলঘেঁষা গ্রামে গিয়ে যদি দিন কতক থাকতে পারেন তাহলে অপনার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে উপরের তথ্যটির

অসারতা, প্রায় প্রতিটি নিম্নবিত্ত বাড়ির মহিলারা সকাল-সন্ধ্যা জঙ্গলের কোল ঘেঁষা অঞ্চলে চলে যাচ্ছেন জীবনধারণের রসদের সন্ধানে। কেউ ধরছেন মাছ, কেউ ধরছেন কাঁকড়া, কেউবা সংগ্রহ করছেন শুকনো কাঠ। বস্তুত এদের জীবন বাজি রেখে সংগ্রহ করা এইসব ছোট ছোট উপাদানে সচল হয়ে আছে ঐ সংসার।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দেখেছি বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই মহিলাদের জঙ্গল নির্ভরতা যেন বেড়ে চলেছে। স্বামীর অকালে মৃত্যু কিংবা পুত্রের অবহেলা এদের বেঁচে থাকাকে যখন প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তখন অনিবার্যভাবে এঁদের হাত পাততে হচ্ছে জঙ্গলের কাছে। যৌবনে স্বামীর সঙ্গী হয়ে যিনি গভীর সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়া ধরেছেন, যিনি ভয়াল রয়েল বেঙ্গলের মুখোমুখি হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় ফিরিয়ে আনতে পারেননি স্বামীকে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে গ্রামের প্রান্ত ঘেঁষা জঙ্গলে ধীর পায়ে জাল টেনে মাছ-কাঁকড়া ধরছেন ভাঁটার সময়— এই দৃশ্য সুন্দরবনের অতি পরিচিত। জঙ্গল এখানে মানুষের কাছ থেকে যেমন সবকিছু কেড়ে নেয়, তেমনি পরম মমতায় জোগান দেয় বেঁচে থাকার মহার্ঘ রসদ।

ইংরেজদের হাত ধরে বন ধ্বংস করে আবাদ করার কাজ যখন প্রায় শেষের পথে তখন জঙ্গলে গিয়ে কাঠ বা মধু সংগ্রহে কোনও সরকারী বিধিনিষেধ ছিলনা। স্বাধীনতার পরেও অনেকদিন একই অবস্থা চলেছিল। সেই যুগে বাঘ-সাপ-কুমিরের হাতে প্রাণ হারানোর সংবাদ অনেকক্ষেত্রেই এসে পৌঁছায়নি তথাকথিত সভ্য সমাজে। এখন সময় পাল্টে গেছে অনেকটাই। 'কোর এরিয়া'-র জঙ্গলকে ঘিরে ফেলা হয়েছে প্রায় সব জায়গাতেই হলুদ রঙের নাইলনের জাল দিয়ে এখন জঙ্গলে ঢোকার সময় (কোন মাস থেকে কোন মাস) যেমন নির্দিষ্ট তেমনি নির্দিষ্ট কত জন কি কি জিনিস নিয়ে কত দিনের জন্য থাকতে পারবেন জঙ্গলে, নির্দিষ্ট এটাও যে কোনও জিনিস কতটা পরিমাণে তাঁরা নিয়ে আসতে পারবেন গহন সুন্দরবন থেকে। অনেকেই সরকারি বিধিনিষেধ আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাকের কথা বলবেন। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই আজ থেকে তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর আগে জঙ্গলে ঢোকা আর আজকের জঙ্গলে ঢোকার মধ্যে সত্যিই আসমান-জমিন ফারাক। জঙ্গল থেকে কাঠ আনা বা বন্য প্রাণী মারা যে বে-আইনি সে কথা আজ সুন্দরবনের ছোট বাচ্চাও জানে, জানে 'সিজিন' ছাড়া কাঁকড়া ধরা বা মধু সংগ্রহের নিষেধাজ্ঞার কথাও। তবে সবক্ষেত্রে সেসব নিষেধ যে তাঁরা মেনে চলেন বা বলা ভালো মেনে চলতে পারেন এমনটা নিশ্চয়ই নয়।

একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর কোনও জঙ্গলের সাথে এই জঙ্গলের তুলনা করা চলে না। এখানে প্রতি পদে লুকিয়ে আছে মৃত্যুর হাতছানি। এই জঙ্গলে একটি পা ফেলে অন্য পাটিকে টেনে তুলতে মাথার

ঘাম পা-এ চলে যায়। এখানে হাঁটু সমান থকথকে কাদার নিচে লুকিয়ে থাকে সমকোণে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ম্যানগ্রোভের তীক্ষ্ণ শুলো। এখানে জোয়ারের জলের সাথে সরু খাঁড়িতেও ঢুকে আসে ভয়ঙ্কর মোহনার কুমির বা কালান্তর কামট। এখানে গাছের ডাল থেকে নিঃশব্দে নেমে আসে মারাত্মক বিষাক্ত সাক্ষাৎ মৃত্যুর সমার্থক নানা ধরনের সাপ। আর ডাঙায় ক্ষিপ্র ভয়ঙ্কর রয়েল বেঙ্গল। সরকারি হিসাবে গতানুগতিক গলদ সংশোধন করে লুকোনো ক্যামেরার নজরদারির পরেও যার সংখ্যা সত্তরে নিচে নামানো যায় নি। সন্দেহ নেই এই ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হওয়া আর মৃত্যুর মাঝে থাকে কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান। আমরা (শহুরে গবেষক, প্রাবন্ধিক, পরিবেশবিদরা) যখন বন ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত করি সাধারণ প্রান্তবাসী মানুষদের তখন একবারও ভাবি না ভয়াল এই জঙ্গলের মুখোমুখি হয়ে একান্ত প্রিয়জনকে চিরকালের মত হারিয়ে ফেলার পরও কি কেউ শখ করে যেতে চাইবেন এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে? ২০১৫ সালের জুলাই সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় (শুধু সুন্দরবন চর্চা) বাঘের আক্রমণে নিহত একজন মানুষের মৃতদেহের ছবি ছেপেছিলাম, বীভৎস সেই দেহ দেখে অনেকেই আমাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন। যে ভয়ঙ্করের 'ছবি' পর্যন্ত আমরা সহ্য করতে পারছি না, যে ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়ানো কষ্টের সে বোধ আমাদের কবে হবে কে জানে? এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম কারণ, যে যুবকের মৃতদেহের ছবি আমরা প্রকাশ করেছিলাম তাঁর স্ত্রী তার ছোট ছোট দুটি বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য এখন জঙ্গলজীবী। হ্যাঁ ২০১৫ সালেও এই আমাদের সুন্দরবনের প্রকৃত চিত্র। এখানে মৃত্যুর সাথে প্রতি রাত কাটানো, জেগে ওঠাও মৃত্যুর সাথেই।

সাতজেলিয়ার সেই ঠাকুমার কথা খুব মনে পড়ছে, লক্ষ্মী মণ্ডল (নাম পরিবর্তিত)। স্বামীকে বাঘের মুখে পড়তে দেখেছেন নিজের চোখে। চুলকাটির জঙ্গলে বাঘ যখন তাঁর স্বামীকে নৌকা থেকে তুলে নিয়ে যায় তখন সারাদিন কাঁকড়া ধরে ফিরে নৌকায় রান্না করছিলেন লক্ষ্মী। বাঘের পিছু ধাওয়া করে জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছুদূর গেলেও লক্ষ্মী ও তাঁর তিন সঙ্গী সেই মানুষটির স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে একটি তেলচিটে বিবর্ণ গামছা ছাড়া কিছুই ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। সেই দুর্ঘটনা এখন আর লক্ষ্মী ঠাকুমাকে আতঙ্কিত করে না। খুব স্বাভাবিক মুখে বলে যান সেই বিবরণ— "ঐ জঙ্গলের ধারে কাঁকড়া মারি আসি আমরা বসি আছি নৌকায়, তোমার ঠাকুর্দা একটা বিড়ি ধরায়ে ওধারে বসিছে, আমি এধারে রান্নার জোগাড় করতিছি— এমন সময় এধারে ওধারে হেতাল গাছ ছিল, লাফ দিয়ে আসি পড়ল— এখ বারি, নিয়ি হাঁটা দিল।"

এখন ঠাকুমার দুই ছেলে আলাদা ঘর করে থাকে। এক মেয়ের আগেই বিয়ে হয়েছিল, সে থাকে হাসনাবাদে। ঠাকুমাকে দেখার কেউ নেই। ঠাকুমা যে ঘরে থাকেন সেটা দেখলে আমাদের শহুরে সত্ত্বা শিউরে ওঠে। গাঁড়াল নদীর বাঁধের পাশে খাস

জমিতে তাঁর ছোট্ট একটি ছিটে বেড়ার ঘর। বাঁধ এখানে আইলার সময় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে বাঁশ আর বালির বস্তা দিয়ে আটকোনো রয়েছে। সরকারি নথিতে 'আইলা প্রজেক্ট' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে জায়গাটা। মাপজোক হয়েছে সেও প্রায় বছরখানেক আগে। ব্লক পিচিং-এর পাকা বাঁধ হবে এখানে। কিন্তু সেই দুই হাজার নয় সালের আইলার পর আজ পর্যন্ত সে কাজ হয়ে ওঠেনি। আজ যখন ভরা জোয়ারে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসে প্রবল ঢেউ, দুর্বল বাঁধের মাথায় মাথায় হয়ে থাকে দুরন্ত নদীর জল, তখন ঠিক তার নিচে লক্ষ্মী ঠাকুমা তাঁর ছোট ঘরটিতে ভেজা কাঠ কোনও রকমে জ্বালিয়ে ফুটিয়ে নিতে চান তাঁর একবেলার অকিঞ্চিৎকর আহার। হ্যাঁ নিজের চোখেই দেখেছি সরকারি হিসাবে তিনি 'বি.পি.এল'-নন। তাঁর ছেলেরা দুটাকা কেজি সরকারি চাল পেলেও তিনি আজ অবধি সে কোটায় নাম তুলতে পারেন নি। লক্ষ্মী ঠাকুমার সাথে মাস তিনেক আগে বাঁধের ওপর সন্ধ্যে বেলা দেখা, দুটো বড় কাঁকড়া পেয়েছে নদীতে বিক্রি করতে চলেছে 'খটি'তে। আমায় দেখে এক গাল হেসে বললেন "একটা কাঁকড়া নেবা।"

রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কূপ-নলকূপ অনেক কিছুই সুন্দরবনকে নতুনরূপ দিচ্ছে পাল্টে যাচ্ছে প্রতিদিন সুন্দরবনের সেই চিরকালীন পশ্চাদবর্তীতা, তবু এই প্রান্ত সুন্দরবনের জঙ্গলঘেঁষা গ্রামগুলোর মানুষের জঙ্গল নির্ভরতা বাড়ছে বই কমছে না।

প্রথম প্রথম যখন সুন্দরবনে গিয়ে সজনেখালির উল্টো পাড়ের টুরিস্ট লজ-এ থাকতাম তখন দেখা হয়েছিল তরুণী গৃহবধূ সঞ্চিতা গায়েন-এর সাথে। একটা ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে ভেসে আসা ক্যাওড়ার ফল কুড়োচ্ছে সে। খুব ভোরে উঠে নদী বাঁধের ধারে বসেছিলাম— গল্পে গল্পে সে বলল অনেকদিন বাদে শ্বশুর এসেছে বাড়িতে। তাকে সে ক্যাওড়া ফলের টক রান্না করে খাওয়াবে, তাই সকাল থেকে বেড়িয়েছে। দারিদ্র্যের চিহ্ন আঁকা ছিল তার শাড়িতে, শরীরে কিন্তু তার মুখে কোথাও অতৃপ্তির বেদনা দেখিনি। দূরে বোঝা বাধা গাছের ডাল— তার দুপুরের রান্নার জ্বালানী। ঝুড়ি ভরে গেছে কেওড়ার ফলে, তার শ্বশুরমশাই ভালোবাসেন— উজ্জ্বল মুখে বারবার বলছিল— কাকভোরে ওঠে নদীর ধারে ধারে ঘুরে সংগ্রহ করতে পেরেছে এই ফল। নদীর জলের সাথে ভেসে আসা এই নগণ্য ফলকে কি বলব? জঙ্গলের দান! একেও কি বলব না জঙ্গল নির্ভরতা। আজও তাই সুন্দরবনের সুখ-দুঃখ জুড়ে আছে জঙ্গলই।

সুন্দরবনের মেয়েদের জঙ্গল নির্ভরতা কোন পর্যায়ে রয়েছে সে তথ্য জানার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি জঙ্গল ঘেঁষা গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহের। এতকাল সুন্দরবন নিয়ে আমরা যেসব কথা শুনে এসেছি তার একটি চেনা ছবি হল স্বামীরা যখন জঙ্গলে যান তখন তেল সিঁদুর মাথায় না দিয়ে ঘরে থাকেন তাঁদের স্ত্রীরা। পৃথিবী এগিয়ে

চলেছে— সুন্দরবন কি থেমে আছে সেই অতীতের দু-তিনটি ক্লিসে হয়ে যাওয়া গদ্যে-উপন্যাস-আখ্যানের দুনিয়ায়? আজকের সুন্দরবনের মেয়েরা হাত পা গুঁটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তাদের সংসার অচল হয়ে যেত অনেক আগেই। জঙ্গলের মধু, কাঁকড়া বা মাছ ধরার দলে মেয়েদের উপস্থিতির সংখ্যাও কিন্তু লক্ষণীয়। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন এখানেই যে ঠিক কতজন মহিলা নিয়মিত গভীর জঙ্গলে যান? কতজন তাঁদের গ্রাম লাগোয়া নদীর ওপারের জঙ্গলের পাশে যান বেঁচে থাকার তাগিদে।

যেভাবে দেশের অন্য জায়গার মহিলাদের অবস্থান নির্ণিত হয় সরকারি নথিতে সেই ভিত্তিগুলি কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন এই বনাঞ্চলে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি। এখানে প্রতিটি ভরা জোয়ার বয়ে আনে বন্যার ভ্রূকুটি, এখানে জঙ্গলে কাটানো প্রতিটি রাত আসলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথেই সহবাস।

ছবির বইতে, সিনেমায় বা তথ্যচিত্রে আমরা যে জঙ্গল দেখতে পাই সুন্দরবনের, তারসাথে প্রকৃত গহন সুন্দরবনের তফাতটা লিখে বা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বনবিভাগের বিধিনিষেধের জাল তুলে একবার বে-আইনিভাবে জেলে নৌকায় চেপে গহীন সুন্দরবনে ঢোকার অপরাধ করেছিলাম। ছোট খাঁড়িতে দুদিক থেকে নিচু হয়ে আসা জঙ্গল সরিয়ে হাত কুড়ি এগিয়েছে সবে নৌকা— কানে এল খট্ খট্ শব্দ। নির্ভুলভাবে আমারই দুর্বল দুই দন্ডপাটির পরস্পর সংঘর্ষের অনিবার্য আওয়াজ। ফিরে আসার কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না— আমার অবস্থা দেখে অসম বয়সী বন্ধু বৃদ্ধ জেলে বিজয়দা ও তাঁর স্ত্রী প্রণতি বৌদি নৌকা ঘুরিয়ে আমাকে বাঁধের ওপর নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে বললেন জীবনধারনের খুদ-কুঁড়ো জোগাড় করতে। যে জঙ্গলে দশ মিনিট থাকার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না, সেখানে দিন-রাত কাটানো প্রণতি বৌদিদের অধিকাংশ আমাদের সরকারি নথিতে 'কর্মহীন'। ভাবা যায়!

লেখক 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকার সম্পাদক।